নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ইশতেহার-২০০৮
দিনবদলের সনদ

পটভূমি

মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ এক যুগসন্ধিক্ষণে। ত্রিশ লক্ষ শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে অর্জিত বাঙালি জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন প্রিয় স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ নেতৃত্বদানের সুমহান গৌরবের প্রতীক। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের দুরূহ কর্তব্য সম্পাদন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার সূচনা হয়। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসন ও স্বৈরতন্ত্রের ধারায় ফিরে যায়। একই খুনিরা ৩ নভেম্বর জেলখানায় হত্যা করে চার জাতীয় নেতাকে। এভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, স্বাধীনতার অঙ্গীকার ও একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সুখী সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তোলার সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দেয় সামরিক সরকার ও সামরিক ছাউনিতে তাদের সৃষ্ট দলসমূহ। সংবিধান কর্তন, স্বাধীনতা-বিরোধী যুদ্ধাপরাধী, জঙ্গিবাদে বিশ্বাসী জামাতে ইসলামি প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক শক্তিকে পুনর্বাসিত করা, রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, সন্ত্রাস, কালোটাকা ও পেশীশক্তির পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি গড়ে তোলা হয় লুটপাটের অর্থনীতি। কিন্তু দেশবাসী তা' মেনে নেয়নি। জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ও অগণিত শহীদের আত্মদানের বিনিময়ে ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে দীর্ঘ ২১ বছর পর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে।

আওয়ামী লীগের গৌরবোজ্জ্বল সাফল্য (১৯৯৬-২০০১)

১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সরকারের পাঁচ বছরে সৃষ্টি হয়েছিল সাফল্যের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। মাত্র পাঁচ বছরে বাংলাদেশ খাদ্যে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করে। দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়-ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল থাকে। মূল্যস্ফীতির হার ১.৫৯ শতাংশে নেমে আসে। পক্ষান্তরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশে উন্নীত হয়। গঙ্গার পানি বণ্টন চুক্তি, পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মর্যাদা অর্জন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভ, ডি-৮ ও বিমসটেক প্রভৃতি উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ফোরাম গঠন এবং এসোসিয়েশন ফর এশিয়ান পার্লামেন্টারিয়ান ফর পিস (এএপিপি) গঠন, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে নতুন মর্যাদার আসনে অভিষিক্ত করে। দারিদ্র্য বিমোচনে নানারকম উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দারিদ্র্য হ্রাসের বার্ষিক গড় হার ০.৫০ শতাংশ থেকে ১.৫০ শতাংশে উন্নীত হয় এবং মানব দারিদ্র্য সূচক ৪১.৬ থেকে ৩২ শতাংশে নেমে আসে। মানব উন্নয়ন সূচকে জাতিসংঘের ৫৬ পয়েন্ট অর্জন, সাক্ষরতার হার ৬৫ শতাংশে উন্নীতকরণ, শিক্ষানীতি প্রণয়ন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সেশনজট দূরীকরণ ছিল জাতির অগ্রগতির পরিচায়ক। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অর্জিত হয় বিস্ময়কর সাফল্য। মাত্র পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৩০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ, গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি ও আহরণের ব্যবস্থা, যমুনা নদীতে বঙ্গবন্ধু সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন, ৬২ হাজার কিলোমিটার কাঁচা-পাকা রাস্তা এবং ১৯ হাজার সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ

প্রভৃতির মাধ্যমে একটি নির্ভরযোগ্য ভৌত অবকাঠামোর ভিত্তি রচিত হয়। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় পাঁচ বছরে জাতীয় আয়ের ১৪.৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ১৮ শতাংশে এবং বিনিয়োগের হার ২০ শতাংশ থেকে ২৩.১ শতাংশে উন্নীত হয়। আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরে দেশে ছোট-বড় প্রায় ১ লাখ ২২ হাজার শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়। বেসরকারি উদ্যোগকে সুযোগ দিয়ে লাখ লাখ বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারি উদ্যোগে প্রতি ৬ হাজার মানুষের জন্য ১টি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের পাশাপাশি চিকিৎসার যন্ত্রপাতির ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করে বেসরকারি খাতে হাসপাতাল ও ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। মনোপলি ভেঙে দিয়ে ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার মোবাইল মাত্র ২ হাজার টাকায় মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা, শুল্কহার কমিয়ে কম্পিউটার ও তথ্য-প্রযুক্তিকে সকলের জন্য অবারিত করে দেওয়া হয়। ফলে বাংলাদেশ ডিজিটাল যুগে প্রবেশ করে।

কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ বাতিল, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার, জেলহত্যার বিচার প্রক্রিয়া শুরু এবং আইন সংস্কার কমিশন গঠন প্রভৃতির মাধ্যমে আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠন করা হয় প্রশাসন সংস্কার কমিশন। নারীর ক্ষমতায়ন অধিকার প্রতিষ্ঠায় গ্রহণ করা করা বহুবিধ পদক্ষেপ। ১৯৯৭ সালে প্রণয়ন করা হয় একটি প্রগতিশীল নারী নীতিমালা। প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর প্রথা, স্থায়ী কমিটিতে মন্ত্রীর বদলে সদস্যদের থেকে চেয়ারম্যান নিয়োগসহ সংসদে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়নের লক্ষ্যে চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। দেশকে পুনরায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার ধারায় ফিরিয়ে আনা হয় এবং বাঙালি সংস্কৃতি ও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবকে পুনরুজ্জীবিত করতে গ্রহণ করা হয় নানামুখী পদক্ষেপ।

বস্তুত বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পাঁচ বছরের শাসনকালে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ। অমিত সম্ভাবনার দেশ হিসেবে বিশ্বসভায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এই পাঁচ বছর স্বর্ণযুগ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বিএনপি-জামাত জোট সরকারের দুর্নীতি ও দুঃশাসন, সংকটাপন্ন বাংলাদেশ

কিন্তু বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছরে দুঃশাসনের ফলে এই সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঘটে। দেশ পরিণত হয় মৃত্যু উপত্যকায়। সরকারি মদতে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার লক্ষ্যে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নারীনেত্রী আইভি রহমানসহ ২৪ নেতা-কর্মীকে হত্যা করা হয়, সাবেক অর্থমন্ত্রী ও সংসদ সদস্য এএমএস কিবরিয়া, শ্রমিক নেতা ও সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার, অ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল ইমাম ও মমতাজউদ্দিনসহ আওয়ামী লীগের ২১ হাজার নেতা-কর্মী বিএনপি-জামাত জোট ও তাদের সহযোগী সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সহ লাখ লাখ আওয়ামী লীগ সমর্থক রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়ে হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হাজার হাজার নারী ও নারীশিশু হয় ধর্ষণ, গণ-ধর্ষণের শিকার। শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, নারী-শিশু, ব্যবসায়ী– কেউই ওই ফ্যাসিস্ট বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা পায়নি। জনগণের জীবন হয়ে পড়ে নিরাপত্তাহীন। সরকারি মদতে উগ্র সাম্প্রদায়িক জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান, গ্রেনেড হামলা, বোমাবাজী এবং একের পর এক হত্যাকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশ পরিণত হয় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নতুন টার্গেট। পক্ষান্তরে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড একটা নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। আইনের শাসন ভেঙে পড়ে। বাংলাদেশকে চিহ্নিত করা হয় অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে।

বিএনপি-জামাত জোটের পাঁচ বছরে খাদ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। জোট সরকার ও হাওয়া ভবনের পৃষ্ঠপোষকতায় খাদ্য সন্ত্রাসী সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। আওয়ামী লীগ আমলের তুলনায় দ্রব্যমূল্য ১০০-২০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। মুদ্রাস্ফীতির হার আওয়ামী

লীগ আমলে ১.৫৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ১০ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়। পক্ষান্তরে গড় প্রবৃদ্ধির হার ৫.৬ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৫.১ শতাংশে। পাঁচ বছরে জনসংখ্যা প্রায় ১ কোটি বাড়লেও খাদ্য উৎপাদন আওয়ামী লীগ আমলের ২ কোটি ৬৮ লাখ থেকে কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ৬১ লাখ টন। দারিদ্র্য হ্রাসের হার কমে আবার ০.৫০ শতাংশে নেমে আসে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। গত ৭ বছরে নতুন করে দরিদ্র হয় ১ কোটি ২০ লাখ মানুষ। বাড়ে ধন বৈষম্য। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ হ্রাস পায়।

বিএনপি-জামাত জোট দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের ঘোষণা দিয়ে ক্ষমতায় এলেও, দুর্নীতি-লুটপাট ও দুর্বৃত্তায়নই এই সরকারের নীতি হয়ে দাঁড়ায়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার অতি নিকটজনের নেতৃত্বে ১১১ জন গডফাদারের দৌরাত্ম্য হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য। 'হাওয়া ভবন'কে রাষ্ট্রক্ষমতার প্যারালাল কেন্দ্রে পরিণত করা হয় এবং এটি হয় দেশের সমুদয় দুর্নীতি ও জঙ্গিবাদের প্রসূতি কেন্দ্র। বিএনপি-জামাত জোটের মন্ত্রী, সাংসদ, নেতা-কর্মী এবং দলীয় প্রশাসনের অকল্পনীয় দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, লুটপাট, চাঁদাবাজি প্রভৃতির ফলে টিআইবি পরপর পাঁচবার বাংলাদেশকে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে।

সর্বক্ষেত্রে সরকারের দুর্নীতি, অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার ফলে উন্নয়ন মুখ থুবড়ে পড়ে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট হয়ে ওঠে অসহনীয়। পাঁচ বছরে জোট সরকার ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াতে পারেনি। একমাত্র বিদ্যুৎ খাতেই ২০ হাজার কোটি টাকা লুটপাট ও অপব্যয় হয়েছে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকটের কারণে শিল্প ও কৃষি উৎপাদনে সৃষ্টি হয় চরম সংকট। বিদ্যুতের দাবি জানাতে গেলে কানসাটে ২০ জন কৃষককে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বস্তুত জোট সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও নারী উন্নয়নসহ সকল ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়।

জোট সরকার জনপ্রশাসন, পুলিশ বাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী, বিচার বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, রাষ্ট্র ও সরকারের সকল অঙ্গ প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। শত শত উচ্চপদস্থ বেসামরিক, সামরিক ও পুলিশ কর্মকর্তাকে পদচ্যুত, বাধ্যতামূলক অকালীন অবসর প্রদান করার পাশাপাশি দলীয় অনুগত অযোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ম বহির্ভূতভাবে পদোন্নতি প্রদান ও নিয়োগ দান করে। দলীয় ক্যাডারদের নিয়োগদানের জন্য কর্মকমিশনের প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। দলীয় অনুগত ব্যক্তিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন করে সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের চাকরির বয়সসীমা ২ বছর বৃদ্ধি করা হয়। অযোগ্য, দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের বিচারপতি নিয়োগ করে সর্বোচ্চ আদালতের মর্যাদা ও মানুষের শেষ ভরসাস্থলটিকে ধ্বংস করা হয়।

বিএনপি-জামাত জোট সংসদকে অকার্যকর এবং সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে। সংসদে বিরোধীদলকে কথা বলতে না দেওয়া, স্থায়ী কমিটিগুলোর কর্মকাণ্ডকে স্থবির এবং ব্রুট মেজরিটির জোরে গণতন্ত্র চর্চার সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়। ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশে নির্বাচন কমিশনকে আজ্ঞাবহ দলীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে। সংবিধান ও সুপ্রিমকোর্টের রায় উপেক্ষা করে ১ কোটি ১৩ লাখ ভুয়া ভোটারসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩ শতাধিক দলীয় ক্যাডারকে নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগদান করে। জনগণের ভোটাধিকার হরণ ও কারচুপিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়, যার ফলে পুরো নির্বাচন ব্যবস্থা বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমল (অক্টোবর ২০০৬-নভেম্বর ২০০৮)

পছন্দের লোকের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করতে গিয়ে তীব্র গণপ্রতিরোধের সম্মুখীন হয় বিএনপি-জামাত জোট সরকার। বিদায়ের মুহূর্তে ২০০৬ সালের অক্টোবরে সারাদেশে

আওয়ামী লীগের ৭০ জন নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। বিএনপি-জামাত জোট পুনরায় ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্য তাদের নীলনকশা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংবিধান লংঘন করে দলীয় রাষ্ট্রপতি ড. ইয়াজউদ্দিনকে প্রধান উপদেষ্টা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে। ড. ইয়াজউদ্দিনের পুতুল তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিএনপি-জামাত জোটের নির্দেশ মানতে গিয়ে অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচনের সকল সম্ভাবনা নস্যাৎ করে। তাদের এসব কর্মকাণ্ডের ফলেই ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারির পটপরিবর্তন সংঘটিত হয়। ড. ইয়াজউদ্দিন প্রধান উপদেষ্টার পদ থেকে অপসারিত হন। সেনাবাহিনীর সমর্থনে ড. ফখরুদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে নতুন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। দেশে জারি হয় জরুরি অবস্থা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ থাকে।

ইতোমধ্যে বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নানা সীমাবদ্ধতা, দুর্বলতা, ভুল-ত্রুটি ও সফলতা নিয়ে প্রায় ২ বছর সময়কাল অতিক্রম করেছে। এই সরকার বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ, নির্বাচন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, দুদক প্রভৃতি পুনর্গঠন করেন। সরকারের আরেকটি ইতিবাচক কাজ হলো ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সশস্ত্র বাহিনী এ কাজটি সম্পন্ন করায় প্রশংসা অর্জন করে। সরকার নির্বাচনী আইন এবং প্রক্রিয়ারও উল্লেখযোগ্য সংস্কার সাধন করে।

আসন্ন নির্বাচন বাংলাদেশের সামনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সংকটজাল ছিন্ন করে উন্নয়নের গতিপথে দেশকে পুনর্স্থাপিত করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে অতীতের সকল গ্লানি, ব্যর্থতা, সংঘাতময় রাজনীতির ঐতিহ্য পেছনে ফেলে প্রিয়-মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় স্বাধীনতার অঙ্গীকার ক্ষুধা-দারিদ্র্য-নিরক্ষরতা, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের অভিশাপমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিম্নলিখিত দিনবদলের নির্বাচনী ইশতেহার উপস্থাপন করছে।

আমাদের অঙ্গীকার, কর্মসূচি ও ঘোষণা

সংকটের আবর্তে নিমজ্জমান অবস্থা থেকে দেশকে পুনরুদ্ধার করে একটি উন্নত সমৃদ্ধ সুখী সুন্দর জীবন গড়ে তোলাই হচ্ছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের একমাত্র ব্রত। আগামী ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী। আর ২০২০ সাল হবে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী।

আমরা ২০২০-২১ সাল নাগাদ এমন এক বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি যেখানে সম্ভাব্য উচ্চতম প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি দারিদ্র্যের লজ্জা ঘুচিয়ে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত করবে। একটি প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক সহিষ্ণু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যেখানে নিশ্চিত হবে সামাজিক ন্যায় বিচার, নারীর অধিকার ও সুযোগের সমতা, আইনের শাসন, মানবাধিকার, সুশাসন, দূষণমুক্ত পরিবেশ। গড়ে উঠবে এক অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল উদার গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্র। এই ভিশন ও রূপকল্পের আলোকেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রণয়ন করবে উপযুক্ত কৌশলপত্র, যার মূলে থাকবে পরিবর্তন বা দিনবদলের অঙ্গীকার। এই কৌশলপত্রে থাকবে দীর্ঘমেয়াদি পরিপ্রেক্ষিত এবং স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা।

এই রূপকল্প বিবেচনায় রেখেই প্রণীত হয়েছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার। আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারের পরিশিষ্টে রূপকল্পটি সংযোজিত হয়েছে।

বিশ্বমন্দা এবং জাতীয় সমস্যাবলীকে বিবেচনায় রেখে উল্লেখিত রূপকল্প বা ভিশন ২০২১ সামনে রেখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিম্নলিখিত নির্বাচনী অঙ্গীকার, কর্মসূচি ও ঘোষণা দেশবাসীর সামনে উপস্থাপন

করছে। ২০০৫ সালের ১৫ জুলাই ঘোষিত ১৪ দলের ৩১-দফা সংস্কার কর্মসূচি এবং ২২ নভেম্বর গৃহীত ২৩-দফা অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচির আলোকে এবং বিগত ৭ বছরের অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে প্রণীত হয়েছে এই কর্মসূচি। বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট বিবেচনায় পাঁচটি বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়

১. দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবিলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা :

১.১ **দ্রব্যমূল্য :** দ্রব্যমূল্যের দুঃষহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হবে। দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সময় মতো আমদানির সুবন্দোবস্ত, বাজার পর্যবেক্ষণসহ বহুমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মজুতদারি ও মুনাফাখোরি সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া হবে, চাঁদাবাজি বন্ধ করা হবে। 'ভোক্তাদের স্বার্থে ভোগ্যপণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ' গড়ে তোলা হবে। সর্বোপরি সরবরাহ ও চাহিদার ভারসাম্য সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য কমানো হবে ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১.২ বিশ্বমন্দা : বিশ্বমন্দার প্রভাব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার জন্য নীতি প্রয়োজন, পরামর্শ প্রদান, তথ্য ভাণ্ডার গড়ে তোলা ও প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য জরুরিভিত্তিতে একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হবে। বিনিয়োগ, জ্বালানি নিরাপত্তা, মুদ্রামান সুরক্ষা ও রফতানি সহায়তা এবং জনশক্তি রফতানি অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২. দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা : দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দিতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনোপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতি দফতরে গণঅধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য নাগরিক সনদ উপস্থাপন করা হবে। সরকারি কর্মকাণ্ডের ব্যাপকভাবে কম্পিউটারায়ন করে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা হবে।

৩. বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

৩.১ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সমস্যা সমাধানে একটি দীর্ঘমেয়াদি সমন্বিত সার্বিক জ্বালানি নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। তেল, গ্যাস, কয়লা, জলবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস ও জৈবশক্তি, বায়ুশক্তি ও সৌরশক্তিসহ জ্বালানির প্রতিটি উৎসের অর্থনৈতিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে। আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তিন বছর মেয়াদি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের আওতায় বর্তমানে নির্মাণাধীন ও গৃহীত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র দ্রুত বাস্তবায়ন, জরুরিভিত্তিতে ১০০-১৫০ মেগাওয়াট গ্যাস টারবাইন প্রকল্প, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণসহ আওয়ামী লীগ আমলে বেসরকারি খাতে ১০, ২০ ও ৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এছাড়া পুরনো বিদ্যুৎ কেন্দ্র মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও ওভারহোলিংয়ের ব্যবস্থা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা হবে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হবে।

আগামী তিন বছরে অর্থাৎ ২০১১ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫ হাজার মেগাওয়াটে, ২০১৩ সালের মধ্যে ৭ হাজার মেগাওয়াটে এবং ২০২১ সালে ২০ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে।

৩.২ তেল ও নতুন গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ও আহরণের কাজে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। গ্যাস ও এলপিজি'র সরবরাহ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হবে।

৩.৩ জাতীয় স্বার্থকে সমুন্নত রেখে কয়লানীতি প্রণয়ন করা হবে। এ যাবৎ প্রাপ্ত কয়লার অর্থনৈতিক ব্যবহার এবং কয়লাভিত্তিক নির্মাণে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। নতুন কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৪. দারিদ্র্য ঘুচাও বৈষম্য রুখো : আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশল ও লক্ষ্যমাত্রা অনুসরণ করা হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান কৌশল হবে কৃষি ও পল্লী জীবনে গতিশীলতা। হতদরিদ্রের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বিস্তৃত করা হবে। ২০১৩ সালের মধ্যে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্র্যের হার যথাক্রমে ২৫ ও ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। বর্তমানের ৬.৫ কোটি দরিদ্রের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৪.৫ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.২ কোটি। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য অন্যান্য পদক্ষেপের সঙ্গে বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের গৃহীত প্রকল্প 'একটি বাড়ি একটি খামার' আশ্রায়ন, গৃহায়ন, আদর্শ গ্রাম, ঘরে ফেরা, বাস্ত বায়ন করা হবে। বয়স্ক ভাতা, দুস্থ মহিলা ভাতা, সুবিধাভোগিদের সংখ্যা কমপক্ষে দ্বিগুণ করা হবে। কর্মসংস্থান ব্যাংকে প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে তরুণ উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা হবে। বর্তমান দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র পুনর্মূল্যায়ন করে নতুন পিআরএসপি প্রণয়ন করা হবে।

৫. সুশাসন প্রতিষ্ঠা : ৫.১ সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ শক্ত হাতে দমন করা হবে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে।

৫.২ বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে। বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর ও জেলখানায় চার নেতার হত্যাকাণ্ডের পুনর্বিচার সম্পন্ন করা হবে। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগ করা হবে। মানবাধিকার লংঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা হবে।

৫.৩ নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার অব্যাহত থাকবে। জাতীয় সংসদকে কার্যকর ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কতিপয় সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেয়া হবে।

৫.৪ রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নিষিদ্ধ করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করা হবে। রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে শিষ্টাচার ও সহিষ্ণুতা গড়ে তোলা হবে এবং সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজি নিষিদ্ধ হবে। একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.৫ প্রবাসী বাঙালিদের জাতি গঠনে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হবে। রেমিটেন্সের বিনিয়োগ এবং প্রবাসী মূলধনকে আকৃষ্ট করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে। প্রবাসীদের মেধার সদ্ব্যবহারের জন্য পরামর্শক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হবে।

৫.৬ দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা হবে। প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্নেন্স চালু করা হবে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে।

৫.৭ জনজীবনে নিরাপত্তা বিধানে পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা হবে। তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
৫.৮ রংপুর নতুন বিভাগ গঠন করা হবে।
৫.৯ কর্মসংস্থান নীতিমালা : দারিদ্র্য বিমোচন, বেকার সমস্যা সমাধান এবং নাগরিকের জীবনকে অর্থবহ করার উদ্দেশে একটি সার্বিক কর্মসংস্থান নীতিমালা গ্রহণ করা হবে। যার মূল বিষয় হলো– ক. গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান খ. আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ঋণ ও প্রশিক্ষণ গ. শিল্পায়নে বেতনভোগী শ্রমিকের জন্য সুযোগ সৃষ্টি ঘ. বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাব-কন্ট্রাক্টিং সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং ঙ. প্রবাসে শ্রমিক রফতানির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা এবং বিশেষ প্রশিক্ষণ। বর্তমানে ২.৮ কোটি লোক বেকার, ২০১৩ সালে তা কমে হবে ২.৪ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ১.৫ কোটি।

গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মসূচি

৬. স্থানীয় সরকার : ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা হবে। জেলা পরিষদকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন সদরকে স্থানীয় উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৭. কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন

৭.১ আমাদের মূল লক্ষ্য 'সবার জন্য খাদ্য' নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে পুনরায় খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হবে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও সুলভ করা হবে ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফসল ও সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে। মাছ, দুধ, ডিম, মুরগি, গবাদি পশু ও লবণ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। দেশীয় চাহিদা পূরণ করে, উদ্বৃত্ত পণ্য রফতানির লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা নেয়া হবে।
৭.২ বর্গাচাষীদের জন্য ঋণ, ক্ষেতমজুরদের কর্মসংস্থান ও তাদের পল্লী রেশনের আওতায় আনা হবে।
৭.৩ বাণিজ্যিক কৃষি, জৈব প্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, গ্রামীণ অকৃষিজ খাতের উন্নয়ন, বিশ্বায়ন মোকাবিলায় উপযুক্ত কর্মকৌশল গ্রহণ করা হবে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষির আধুনিকায়ন, প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং কৃষি গবেষণার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
৭.৪ পল্লী উন্নয়নে নাগরিক সুযোগ-সুবিধার পরিধি বিস্তৃত করা হবে। ভূমিহীনদের মধ্যে খাসজমি বিতরণ, খাস জলাশয় ও জলমহাল প্রকৃত মৎস্যজীবীদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে। সমুদয় জমির রেকর্ড কম্পিউটারায়ন করা হবে এবং জমি, জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা হবে।
৭.৫ উপকূলীয় অঞ্চলে পরিকল্পিতভাবে ভূমি উদ্ধারের ব্যবস্থা করা হবে।

৮. পরিবেশ ও পানি সম্পদ : বিশ্ব উষ্ণায়নের প্রভাব থেকে রক্ষা, দূষণমুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলা এবং পানিসম্পদ রক্ষায় সমন্বিত নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। নদী খনন, পানি সংরক্ষণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙন রোধ, বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি প্রাপ্তি সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পরিবেশ ও পানিসম্পদ রক্ষায় কার্যকর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা হবে।

পানি ও বায়ু দূষণ রোধ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হবে। ভূ-উপরিস্থিত পানির যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

৯. শিল্প বাণিজ্য :

৯.১ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের জন্য দ্রুত শিল্পায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, পুঁজি বাজারের দ্রুত বিকাশ, আইন-শৃঙ্খলা, ঘুষ-দুর্নীতি, প্রশাসনিক জটিলতা এবং রাজনৈতিক পোষকতামুক্ত, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা, উদ্ভাবনী প্রযুক্তি, ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, উদ্যোক্তা শ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম এবং অভ্যন্তরীণ বাজার সম্প্রসারণ প্রভৃতি নীতিমালা সংবলিত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হবে।

৯.২ দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী এবং প্রবাসী বাঙালিদের বিনিয়োগে উৎসাহিত করা। বিনিয়োগকারীদের জন্য আনুষ্ঠানিকতা ও আইনি জটিলতা সহজিকরণ করে ওয়ান স্টপ সার্ভিস কার্যকর করা হবে। দেশীয় শিল্পের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

৯.৩ আইটি শিল্পের উন্নয়ন, পোশাক ও টেক্সটাইল খাতকে সম্প্রসারণ, বিপদমুক্ত ও শক্তিশালী করা, জাহাজ নির্মাণ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, ওষুধ, চামড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, খেলনা, জুয়েলারি ও আসবাবপত্র শিল্পের বিকাশকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পাটের বিকল্প ব্যবহার ও পাট শিল্পকে লাভজনক করতে নেয়া হবে বিশেষ উদ্যোগ।

৯.৪ ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্পের বিকাশে সহায়তা দান, তাঁত শিল্প রক্ষা ও রেশম, বেনারসি ও জামদানি পল্লী গড়ে তোলাসহ তাঁতী, কামার, কুমার ও মৃৎ শিল্পীদের বিশেষ প্রণোদনা দেওয়া হবে। আখ চাষ ও চিনি শিল্পসহ কৃষিনির্ভর শিল্পকে উৎসাহিত করা, বাজার সৃষ্টি ও রফতানিতে সর্বতোভাবে সহযোগিতা দেয়া হবে। পর্যটন খাতে বিকাশ, জনশক্তি রফতানি বৃদ্ধি এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নিশ্চিত করা হবে।

মানব উন্নয়ন

১০. শিক্ষা ও বিজ্ঞান

১০.১ মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও তথ্য-প্রযুক্তি খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হবে। এ লক্ষ্যে যুগোপযোগী নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হবে। ২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তি ১০০ শতাংশে উন্নীত করা এবং ২০১৪ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করা হবে। শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষাঙ্গনকে দলীয়করণমুক্ত, শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতন কাঠামো ও স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন এবং স্বতন্ত্র কর্মকমিশন গঠন করা হবে। পর্যায়ক্রমে স্নাতক পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক সেবায় পরিণত করা হবে।

১০.২ নারীশিক্ষা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি অব্যাহত রাখা হবে।

১০.৩ শিক্ষাঙ্গন সন্ত্রাস, সেশনজট মুক্ত করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে তোলা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হবে। বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণা কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি করা হবে।

১০.৪ রাজধানী ঢাকায় পর্যায়ক্রমে আরো প্রতি থানায় সরকারি মাধ্যমিক হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রতিটি জেলা সদরে সরকারি স্কুলগুলোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রতি উপজেলায় সরকারি মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে।

১০.৫ **তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি :** আইসিটি খাতের সম্ভাবনাকে স্বার্থক করে তোলার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। দেশের প্রতিভাবান তরুণ ও আগ্রহী উদ্যোক্তাদের সর্বোতভাবে সহায়তা দিয়ে সফটওয়্যার শিল্প ও আইটি সার্ভিসের বিকাশ সাধন করা হবে। এতে রফতানি বাড়বে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে। ২০২১ সালের লক্ষ্য হলো ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তরে এবং ২০২১ সালে প্রাথমিক স্তরে আইটি শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গঠিত এবং জোট সরকারের আমলে নিষ্ক্রিয় করা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক টাস্কফোর্স সক্রিয় ও কার্যকর করা হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক, আইসিটি ইনকুবেটর এবং কম্পিউটার ভিলেজ স্থাপন করা হবে।

১০.৬ **প্রতিবন্ধী কল্যাণ :** ২০০০ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন যুগোপযোগী ও বাস্তবায়িত করা হবে। প্রতিবন্ধী মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১. স্বাস্থ্যসেবা ও পরিবার কল্যাণ

১১.১ সকলের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পূর্বতন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি পুনর্মূল্যায়ন করে যুগের চাহিদা অনুযায়ী নবায়ন করা হবে। এই নীতির আলোকে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠিত ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু, পুষ্টি, শিশু ও মাতৃমঙ্গল নিশ্চিত করা হবে। জনসংখ্যা নীতি যুগোপযোগী করা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হবে।

১১.২ আর্সেনিক সমস্যা সমাধান করে ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ সুপেয় পানি এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা হবে।

১১.৩ মানসম্পন্ন ওষুধ উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন ও রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওষুধনীতি যুগোপযোগী করা হবে। হোমিওপ্যাথি, ইউনানি ও আয়ুর্বেদসহ দেশজ চিকিৎসা শিক্ষা এবং ভেষজ ওষুধের মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১১.৪ এইচআইভি/এইডস, কুষ্ঠ, যক্ষ্মাসহ সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের ব্যবস্থা এবং রোগ নিরাময়ে উন্নত চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১২. নারীর ক্ষমতায়ন

১২.১ নারীর ক্ষমতায়ন, সম-অধিকার ও সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা হবে।

১২.২ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা হবে। প্রশাসন ও সমাজের সর্বস্তরের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

১২.৩ নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। নারী ও শিশু পাচার রোধে আঞ্চলিক সহযোগিতাসহ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১২.৪ নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন করা হবে। কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা, কর্মবান্ধব পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৩. শিশু-কিশোর কল্যাণ

পর্যায়ক্রমে সর্বক্ষেত্রে শিশুশ্রম বন্ধ করা হবে। শিশুদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার, প্রলোভন বা জোর করে জড়িত করা হবে না। জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ১৯৭৪ সালের শিশু আইন এবং ১৯৯৪ সালের শিশুনীতি পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করা হবে। তাদের শারীরিক, মানসিক বিকাশে পুষ্টি শিক্ষা ও বিনোদনের উপযুক্ত সুযোগ নিশ্চিত করা হবে। শিশু নির্যাতন বিশেষ করে কন্যা শিশুদের প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন বন্ধ ও তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। পথশিশুদের পুনর্বাসন ও নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪. যুব সমাজ ও কর্মসংস্থান

বছরে ন্যূনতম ১০০ দিনের কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যেক পরিবারের একজন কর্মক্ষম বেকার তরুণ/তরুণীকে কর্মসংস্থানের জন্য 'এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি' স্কিম পর্যায়ক্রমে কার্যকরী করা হবে। সকল কর্মক্ষম নাগরিকের নিবন্ধন করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ নতুন প্রজন্মের সমূদয় যুব সমাজকে দুই বছরের জন্য 'ন্যাশনাল সার্ভিস'-এ নিযুক্ত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

১৫. যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো

১৫.১ পরিবহন, সড়ক নির্মাণ, গৃহায়ন, বন্দর উন্নয়ন ও নির্মাণে উপযুক্ত নীতিমালা গ্রহণ ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। সড়ক নেটওয়ার্কে গ্রাম-ইউনিয়ন-উপজেলা ও জেলা সদরকে সংযুক্ত করার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।

১৫.২ পদ্মা ও কর্ণফুলী সেতু, টানেল নির্মাণ, ঢাকা-চট্টগ্রাম ৪ লেন বিশিষ্ট এক্সপ্রেস সড়ক নির্মাণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং রেলপথ সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন করা হবে।

১৫.৩ এশীয় রেল ও জনপথের আওতায় পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের সাথে রেল ও সড়ক যোগাযোগ স্থাপন করা হবে।

১৫.৪ প্রতিটি ছোট-বড় নদী খনন করা হবে এবং তা যেন সারা বছর নাব্য থাকে তার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিরাপদে স্বল্প খরচে পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য নৌপথের উন্নয়ন ও নৌ পরিবহনের আধুনিকায়ন করা হবে।

১৫.৫ গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ এবং চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে আধুনিকায়ন করে এশিয়ার জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। স্থলবন্দর আধুনিকায়ন করা হবে।

১৫.৬ বাংলাদেশ বিমানকে বাণিজ্যিকভিত্তিতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হবে। বেসরকারি বিমান পরিবহনকে আরো উৎসাহিত করা হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংযোগস্থল হিসেবে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নতুন বিমানবন্দর নির্মাণ করা হবে।

১৫.৭ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত সম্প্রসারিত করা হবে। আগামী পাঁচ বছরে দেশের সব উপজেলাকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতায় আনা হবে।

১৫.৮ স্বল্প খরচে যাতায়াত ও রাজধানীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলওয়েকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এজন্য নতুন রেললাইন স্থাপন করা হবে। রাজধানী ঢাকার জনপরিবহন সমস্যার সমাধান ও যানজটমুক্ত

করার লক্ষ্যে ভূগর্ভস্থ রেললাইন নির্মাণ, আকাশ রেল অথবা সার্কুলার রেলপথ এবং রাজধানীকে ঘিরে নাব্য ও প্রশস্ত নৌপথ নির্মাণ করা হবে।

১৬. শ্রমনীতি

১৬.১ জাতীয় শ্রমনীতি পুনর্মূল্যায়ন ও সংশোধন করা হবে। পুরুষ ও নারী শ্রমিকদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে। জাতীয় ন্যূনতম মজুরি পুনর্নির্ধারণ এবং স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন করা হবে। দক্ষ শ্রমশক্তি রফতানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় ট্রেডভিত্তিক ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

১৬.২ গার্মেন্টস শ্রমিকসহ সকল শ্রমিক, হতদরিদ্র এবং গ্রামীণ ভূমিহীন ক্ষেতমজুরদের জন্য বিশেষ বিবেচনায় রেশনিং প্রথা চালু করা হবে।

১৭. মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধা

১৭.১ স্বাধীনতার স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং তাদের অবদানের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতিস্বরূপ, বিশেষত দুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বৃদ্ধি, বার্ধক্যকালীন ভরণ-পোষণ ও বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। সকল মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত নাগরিক হিসেবে রেল, বাস ও লঞ্চে বিনামূল্যে চলাচলের সুযোগ দেয়া হবে।

১৭.২ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মুক্তিযুদ্ধের বিজয়স্তম্ভ মূল নকশা অনুযায়ী নির্মাণ সম্পন্ন করা হবে। দেশের সর্বত্র মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষা এবং প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরার জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। সারাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন বধ্যভূমি ও গণকবর চিহ্নিতকরণ, শহীদদের নাম-পরিচয় সংগ্রহ এবং স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে।

১৮. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চল

১৮.১ ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, আদিবাসী ও চা বাগানে কর্মরত শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর ওপর সন্ত্রাস, বৈষম্যমূলক আচরণ এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের চির অবসান, তাদের জীবন, সম্পদ, সম্ভ্রম, মান-মর্যাদার সুরক্ষা এবং রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকারের বাস্তব প্রয়োগ নিশ্চিত করা হবে। আদিবাসীদের জমি, জলাধার এবং বন এলাকায় সনাতনি অধিকার সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণসহ ভূমি কমিশন গঠন করা হবে। সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করা হবে। ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘু এবং আদিবাসীদের জন্য চাকরি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

১৮.২ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হবে। অনগ্রসর অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে বর্ধিত উদ্যোগ, ক্ষুদ্র জাতি গোষ্ঠী, আদিবাসী ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি এবং তাদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণ ও তাদের সুষম উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

বস্তি, চর, হাওড়, বাওড় ও উপকূলসহ সকল অনগ্রসর অঞ্চলের মানুষের জীবনের মান উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

১৯. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অবাধ তথ্য-প্রবাহ

১৯.১ সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা হবে। জাতীয়ভিত্তিক ছাড়াও স্থানীয়ভিত্তিক কমিউনিটি রেডিও চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৯.২ সকল সাংবাদিক হত্যার দ্রুত বিচার করে প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা এবং সাংবাদিক নির্যাতন, তাদের প্রতি ভয়-ভীতি-হুমকি প্রদর্শন এবং সকল মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করা হবে।

১৯.৩ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিতরণে বৈষম্যমূলক নীতি, দলীয়করণ বন্ধ এবং সংবাদপত্রকে শিল্প হিসেবে বিবেচনা করে তার বিকাশে সহায়তা প্রদান করা হবে।

২০. প্রতিরক্ষা

২০.১ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে সকল বিতর্কের ঊর্ধ্বে রেখে একটি দেশপ্রেমিক, সাহসী, দক্ষ ও অজেয় প্রতিরক্ষা বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলবে। দেশের ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উন্নত করা হবে। একটি 'জাতীয় প্রতিরক্ষা নীতি' প্রণয়ন করা হবে।

২০.২ প্রতিরক্ষা বাহিনীর নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হবে। সশস্ত্র বাহিনীর অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সংবিধানসম্মতভাবে প্রয়োজনীয় স্বশাসনের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের জন্য কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হবে।

২০.৩ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীসহ আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষায় অধিকতর অংশগ্রহণ ও অবদান রাখার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

২১. সংস্কৃতি ও ক্রীড়া

২১.১ বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক ও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র এবং সৃজনশীল প্রকাশনাসহ সুকুমার শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে রাষ্ট্র প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করবে।

পূর্বতন আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' প্রকল্প পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

২১.২ সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, কূপমণ্ডুকতা, কুসংস্কার এবং জঙ্গিবাদ প্রতিরোধের পাশাপাশি এ ব্যাপারে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও জনগণকে বিজ্ঞানমনস্ক এবং উদার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

২১.৩ কোরআন ও সুন্নাহ্ পরিপন্থি কোনো আইন প্রণয়ন করা হবে না। সকল ধর্মের শিক্ষা ও মূল্যবোধের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

২১.৪ ক্রীড়াঙ্গন ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানগুলোকে দলীয়করণমুক্ত করা হবে। ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণসহ প্রয়োজনীয় সবকিছু করা হবে। শিশু, কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে খেলাধুলা ও শরীরচর্চার ব্যবস্থাকে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের অংশ করা হবে।

২২. সরকার ও এনজিও

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ আইনি কাঠামোর মধ্যে স্বশাসিতভাবে তাদের নিজস্ব বিধি মোতাবেক পরিচালিত হবে। তবে বিধিবদ্ধ এনজিও প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না। তাদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

২৩. পররাষ্ট্র নীতি

ক. বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে। 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়' এই নীতির আলোকে স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা হবে। ভারত, নেপাল, ভুটান ও মিয়ানমারসহ প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক বজায় রেখে বহুমুখী সহযোগিতা জোরদার করা হবে। সার্ক বিমসটেক ও ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলোসহ আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করা হবে।

খ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান ও কানাডাসহ উন্নত দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগিতার সম্পর্ক জোরদার ও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত করা হবে। রাশিয়া, চীন এবং আশিয়ানভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক সুদৃঢ় করা হবে। বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার সঙ্গে অধিকতর যোগাযোগ ও নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হবে।

গ. সৌদি আরব, মিশর, প্যালেস্টাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ এবং তুরস্ক, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াসহ বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন ও সহযোগিতার ক্ষেত্র জোরদার করা হবে। মুসলিম উম্মাহ্‌র সংহতি এবং ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) কাঠামোয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সহযোগিতা জোরদার করা হবে। আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলোর সঙ্গে ফলপ্রসূ সম্পর্ক স্থাপনে পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

ঘ. সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ মোকাবিলায় দক্ষিণ এশীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হবে।

ঙ. আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার এবং উজ্জ্বল করা হবে।

দেশবাসীর প্রতি আহ্বান

প্রিয় দেশবাসী,

আপনারা জানেন বিগত শাসক গোষ্ঠীর কৃতকর্মের জন্য প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ আজ গভীর সংকটে নিপতিত। দেশবাসী আর অতীতের বিএনপি-জামাত জোটের সেই দুঃশাসনের রাজত্বে ফিরে যেতে চায় না। দেশবাসী চায় সন্ত্রাস ও দুর্নীতির কলুষতামুক্ত একটি ন্যায়ভিত্তিক সুন্দর সমাজ ও উন্নয়নের পথে দ্রুত অগ্রসরমান আধুনিক বাংলাদেশ নির্মাণ করতে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তাই নিছক ক্ষমতার রদবদলের জন্য নয়, দেশকে ভয়াবহ সংকট থেকে উদ্ধার করে জনগণের প্রত্যাশা অনুযায়ী উন্নয়ন, গণতন্ত্র, শান্তি ও প্রগতির পথে অগ্রসর করে নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এজন্য আমরা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বা রূপকল্প, আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়নযোগ্য কর্মসূচি এবং আশু ও জরুরি করণীয়সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে হাজির করেছি। আমরা মনে করি, ধর্ম-বর্ণ, শ্রেণী ও দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর সুদৃঢ় ঐক্য এবং সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই উপরোক্ত কর্মসূচি ও অঙ্গীকারসমূহ বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনায় যে অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, আগামী দিনে সে অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আরো দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দেশকে সামনের দিকে অগ্রসর করে নিতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

নতুন প্রজন্মের যে তরুণ-তরুণীরা এবার প্রথম ভোটার হয়েছেন তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্মাণের লক্ষ্যে প্রণীত ভিশন-২০২১ আমরা তাদেরই উৎসর্গ করছি। বিশ্বায়নের এ যুগে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য অপার সম্ভাবনাময় নতুন প্রজন্মের ভোটার তথা তরুণ-তরুণীদের শ্রম, মেধা, জ্ঞান ও মননকে আমরা কাজে লাগাতে চাই। তাদের জন্যই রচিত হয়েছে আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার ও কর্মসূচি। আমরা মনে করি, এ কর্মসূচি ও ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে তরুণ প্রজন্মের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং সম্পৃক্ততার ওপরই এর সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করছে।

সমগ্র জাতির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ইশতেহার বাস্তবায়ন করে আমরা নতুন প্রজন্মকে একটি সুন্দর ও সফল ভবিষ্যৎ উপহার দেব। নতুন প্রজন্মকে তাদের ভবিষ্যৎ নির্মাণ ও জাতি গঠনের এই মহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার জন্য আমরা উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের বর্তমান তোমাদের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করছি।

প্রিয় দেশবাসী

আপনাদের মূল্যবান ভোটে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়ে সরকার গঠন করলে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম কমিয়ে আমরা আপনাদের জীবনে স্বস্তি ও আস্থা ফিরিয়ে আনবো।

দেশবাসীর কাছে আমাদের আহ্বান, আসুন সকল ভেদাভেদ ভুলে আবার আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জেগে উঠি, দিনবদলের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হই। শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য ও দুঃশাসনের চির অবসান ঘটাই। একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও সহিষ্ণু সমাজ গড়ে তুলি। সুখী সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলার সংগ্রামে নবজাগরণ সৃষ্টি করি। গড়ে তুলি বাঙালি জাতির আলোকোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। জনতার জয় সুনিশ্চিত। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। জয় বাংলা। জয় বঙ্গবন্ধু। বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

পরিশিষ্ট

সংকটমোচন ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে আওয়ামী লীগের রূপকল্প (ভিশন ২০২১)

২০২১ সাল নাগাদ কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই

১. তত্ত্বাবধায়ক সরকার, গণতন্ত্র ও কার্যকর সংসদ

* একটি নির্ভরযোগ্য নির্বাচন ব্যবস্থা, নিয়মিত নির্বাচন, সরকারের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হবে। সংসদকে কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২. রাজনৈতিক কাঠামো, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গণঅংশায়ন

* স্থানীয় সরকারকে প্রাধান্য দিয়ে রাজনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হবে। উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়ামক ভূমিকা পালন করবে স্থানীয় সরকার। এ উদ্দেশে জেলা ও উপজেলার স্থানীয় সরকারকে স্বনির্ভর ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

৩. সুশাসনের জন্য আইনের শাসন ও দলীয়করণ প্রতিরোধ

আইনের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে মানবাধিকার সংরক্ষণ করা হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনকে দলীয়করণ মুক্ত করা হবে। নিয়োগ ও পদোন্নতির ভিত্তি হবে মেধা, দক্ষতা, জ্যেষ্ঠতা, সততা এবং দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে প্রজাতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে প্রশাসনকে ব্যবহার বন্ধ নিশ্চিত করা হবে।

৪. রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন

সন্ত্রাস, দুর্নীতি, ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, স্বচ্ছ অর্থায়ন, শিষ্টাচার ও সহনশীল আচরণ প্রতিষ্ঠা করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরে গণতন্ত্র চর্চা ও অধিকতর সংস্কারের লক্ষ্যে যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৫. দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠন

স্বাধীন ও শক্তিশালী দুর্নীতিদমন কমিশনসহ দুর্নীতি দমনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো কার্যকর করে গড়ে তোলা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনি প্রক্রিয়ার পাশাপাশি সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে। নাগরিক অধিকার সনদ রচনা, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা এবং সরকারি দলিল দস্তাবেজ কম্পিউটারায়ন এবং ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে দুর্নীতির পথগুলো সম্ভাব্য সকল উপায়ে বন্ধ করা হবে।

৬. নারীর ক্ষমতায়ন ও সম-অধিকার প্রতিষ্ঠা

রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে নারীর সমান অধিকার ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের নারীনীতি পুনর্বহাল ও কার্যকর করা হবে, বৈষম্যমূলক আইনসমূহের সংস্কার করা হবে এবং সংসদে প্রত্যক্ষ ভোটে নারীর জন্য ১০০ আসন সংরক্ষিত করা হবে।

৭. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উদ্যোগ

ক. মৌলিক চাহিদা পূরণ : সংবিধানের ১৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় আয়ের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ২০১৩ সালে ৮ শতাংশে এবং ২০১৭ সালে ১০ শতাংশে উন্নীত করে ২০২১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখা হবে।

খ. জনসংখ্যা ও শ্রমশক্তির অভিক্ষেপ : ২০২১ সালে জনসংখ্যা হবে ১৬.৫ কোটি। শ্রমশক্তি হবে ১০.৫ কোটি। ২০২১ সালের মধ্যে শ্রমশক্তির অন্তত ৮৫ শতাংশের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বর্তমানে ৪.৫ কোটি কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ২০১৩ সালে হবে ৫.৬ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ৯ কোটি। শিল্পের বিকাশ, কৃষির শ্রমঘন বৈচিত্র্য সাধন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, রফতানি প্রসার ও জনশক্তি বৃদ্ধিসহ কর্মসংস্থানের নানা উদ্ভাবনী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

গ. দারিদ্র্য নির্মূল : আমাদের লক্ষ্য দারিদ্র্য হ্রাস নয় দারিদ্র্য নির্মূল। এ জন্য ২০১৫ সালে না হোক ২০১৭ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রা পূরণের কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বর্তমান দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র পুনর্মূল্যায়ন করে যথোপযুক্ত পিআরএসপি প্রণয়ন করা হবে। ২০২১ সাল নাগাদ বর্তমান দারিদ্র্যের হার ক্রমান্বয়ে ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। ২০১৩ সালে দরিদ্র জনগোষ্ঠী হবে বর্তমানের ৬.৫ কোটির স্থলে ৪.৫ কোটি এবং ২০২১ সালে হবে ২.৫ কোটি। দারিদ্র্য নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত অতি দরিদ্রদের জন্য গড়ে তোলা হবে টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী।

ঘ. খাদ্য ও পুষ্টি : বর্তমান খাদ্য ঘাটতি পূরণ করে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের পুষ্টি চাহিদা নিশ্চিত করা হবে।

ঙ. স্বাস্থ্যসেবা : ২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য দৈনিক ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালোরির উর্ধ্বে খাদ্য, সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল, সকলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, ২০১৩ সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন, ২০২১ সালের মধ্যে গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত, শিশু ও মাতৃ-মৃত্যুর হার কমানো প্রভৃতি নিশ্চিত করা হবে।

চ. শিক্ষা : ২০১১ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার ১০০ শতাংশ, ২০১৭ সালে নিরক্ষরতা সম্পূর্ণ দূর, শিক্ষার মানোন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন প্রজন্ম গড়ে তোলা এবং শিক্ষকদের উচ্চতর বেতন সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। প্রণয়ন করা হবে যুগোপযোগী শিক্ষানীতি।

ছ. শিল্প : ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পায়নের সুদৃঢ় ভিত্তি রচনা করা হবে। জাতীয় উৎপাদনে শিল্প খাতের অবদান দ্বিগুণ উন্নীত করা, কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের উৎপাদনশীল বিকাশকে অগ্রাধিকার প্রদান, তথ্য-প্রযুক্তি খাতের সর্বোত্তম বিকাশ এবং দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির ব্যবস্থা সংবলিত উন্নয়ন কৌশল গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

জ. জ্বালানি নিরাপত্তা : প্রত্যাশিত উন্নয়ন ও শিল্পায়ন নিশ্চিত করতে জ্বালানি নিরাপত্তার দিক-নির্দেশনা সংবলিত জ্বালানিনীতি গ্রহণ করা হবে। ২০১৫ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৮ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করা হবে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সম্ভাব্য বিদ্যুৎ চাহিদা হবে ২০ হাজার মেগাওয়াট। গ্যাসসম্পদের নিয়মিত জরিপ করে অধিকতর গ্যাস উৎপাদনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। জ্বালানির চাহিদা পূরণে অভ্যন্তরীণ বায়োগ্যাস, জলবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তিসহ সম্ভাব্য সকল উৎস ছাড়াও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আঞ্চলিক জ্বালানি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

ঝ. ভৌত অবকাঠামো : সড়ক, রেল, নৌ, বিমান পরিবহন ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করা হবে। রাজধানীর সঙ্গে সমগ্র দেশের স্বল্প খরচে যোগাযোগের ক্ষেত্রে রেলপথকে বিশেষ

গুরুত্ব দেওয়া হবে। পদ্মা সেতু ও কর্ণফুলীতে ঝুলন্ত সেতু/টানেল নির্মাণ, বাংলাদেশকে এশীয় হাইওয়ে ও এশীয় রেলওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করা, বন্দর ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং গভীর সমুদ্রবন্দর নির্মাণ ও তা' এশিয়ার দেশগুলোর জন্য উন্মুক্ত করা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ঢাকায় পাতাল রেল/মনোরেল, সার্কুলার রেলপথ এবং এলিভেটেড (দোতলা) রাস্তা নির্মাণ করে গণপরিবহন সমস্যার সমাধান ও যানজটমুক্ত করা হবে। ঢাকার চতুর্দিকে বৃত্তাকার (অরবিটাল) জলপথ, বেড়িবাঁধ, সড়ক, রেলপথ নির্মাণ করা হবে। জলপথটি নিয়মিত ড্রেজিং করে নাব্য রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঞ. আবাসন : ২০২১ সাল নাগাদ সবার জন্য বাসস্থান নিশ্চিত করা হবে। প্রতিটি ইউনিয়ন ও উপজেলায় 'গ্রোথ সেন্টার' কেন্দ্রিক পল্লী নিবাস ও শহরাঞ্চলে আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসহ আবাসন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হবে।

ত. পরিবেশ : আবহাওয়া পরিবর্তন ও বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে উদ্ভূত বিপর্যয় থেকে বাংলাদেশকে সুরক্ষার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা, পরিকল্পিতভাবে বায়ু দূষণ প্রশমন, শিল্প ও যানবাহনজনিত পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ এবং বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। বনভূমি ও জলাধার সংরক্ষণ এবং নদী ভাঙন রোধসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে বাংলাদেশকে নিরাপদ ভূখণ্ডে পরিণত করা হবে।

থ. পানিসম্পদ : ভবিষ্যতে পানিসম্পদ সংরক্ষণ, বাংলাদেশের প্রাপ্যতা, হিস্যা ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিদ্যমান পানি সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানসহ একটি সমন্বিত পানিনীতি প্রণয়ন এবং আঞ্চলিক পানি নিরাপত্তা গড়ে তুলতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করবে।

৮. বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ

ক. স্বাধীনতা অর্জন : মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ও স্বাধীনতার অর্জনসমূহের সুরক্ষা এবং প্রতিটি নবীন প্রজন্মের মানস গঠনে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গৌরববোধ সঞ্চারিত, স্বদেশানুরাগ এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা জাগ্রত করার লক্ষ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। দেশ গঠনে ও দেশ পরিচালনায় তরুণদের অংশগ্রহণ, তাদের সৃজনশীলতা বিকাশের সর্বোচ্চ সুযোগ দেওয়া হবে।

খ. সংস্কৃতি : বাঙালি সংস্কৃতির অব্যাহত বিকাশকে বাধামুক্ত করা, আবিষ্ক্রিয়া, উদ্ভাবন, শিল্প, সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত ও ক্রীড়াসহ সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক মান অর্জনের মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতায় আমাদের তরুণরা যাতে অবদান রাখতে পারে সে লক্ষ্যে রাষ্ট্র সর্বপ্রকার সুযোগ নিশ্চিত করবে।

গ. পররাষ্ট্র নীতি : আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে 'সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়'– এই মূলনীতি অনুসরণ করা হবে।

রূপকল্প (ভিশন) অনুযায়ী কতিপয় লক্ষ্যমাত্রা

২০১০ সালের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার হবে ১০০ শতাংশ।

২০১১ সালের মধ্যে দেশের সকল মানুষের জন্য নিরাপদ পানির ব্যবস্থা করা হবে।

২০১২ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে।

২০১৩ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থার আওতায় আনা হবে।

২০১৩ সালে বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার হবে ৮ শতাংশ। ২০১৭ সালে এই হার ১০ শতাংশে উন্নীত করে অব্যাহত রাখা হবে।

২০১৩ সালে বাংলাদেশে বিদ্যুতের সরবরাহ হবে ৭ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০১৫ সালে ৮ হাজার মেগাওয়াট। ২০২১ সাল নাগাদ দেশের বিদ্যুৎ চাহিদা ২০ হাজার মেগাওয়াট ধরে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

২০১৩ সালে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

২০১৪ সালে নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

২০১৫ সালের মধ্যে সকল মানুষের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে।

২০২১ সালে জাতীয় আয়ের বর্তমান হিস্যা কৃষিতে ২২, শিল্পে ২৮ ও সেবাতে ৫০ শতাংশের পরিবর্তে হবে যথাক্রমে ১৫, ৪০ এবং ৪৫ শতাংশ।

২০২১ সালে বেকারত্বের হার বর্তমান ৪০ থেকে ১৫ শতাংশে নেমে আসবে।

২০২১ সালে কৃষি খাতে শ্রমশক্তি ৪৮ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়াবে ৩০ শতাংশে।

২০২১ সালে শিল্পে শ্রমশক্তি ১৬ থেকে ২৫ শতাংশে এবং সেবা খাতে ৩৬ থেকে ৪৫ শতাংশে উন্নীত হবে।

২০২১ সাল নাগাদ বর্তমান দারিদ্র্যের হার ৪৫ থেকে ১৫ শতাংশে নামবে।

২০২১ সালে তথ্য-প্রযুক্তিতে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি লাভ করবে।

২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ নাগরিকের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হবে।

২০২১ সালের মধ্যে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২১২২ কিলো ক্যালোরির ঊর্ধ্বে খাদ্য নিশ্চিত করা হবে।

২০২১ সালের মধ্যে সকল প্রকার সংক্রামক ব্যাধি সম্পূর্ণ নির্মূল করা হবে।

২০২১ সালে গড় আয়ুষ্কাল ৭০-এর কোঠায় উন্নীত করা হবে।

২০২১ সালে শিশুমৃত্যুর হার বর্তমান হাজারে ৫৪ থেকে কমিয়ে ১৫ করা হবে।

২০২১ সালে মাতৃমৃত্যুর হার ৩.৮ থেকে কমে হবে ১.৫ শতাংশ।

২০২১ সালে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ ব্যবহারের হার ৮০ শতাংশে উন্নীত করা হবে ।